# সারা জীবনই কি কাটাবো আতঙ্কে?

।। মুনতাসীর মামুন

কলকাতার জবাকুসুম তেল একসময় খুব জনপ্রিয় ছিল। অনেকে কলকাতা থেকে তা আনাতেন। ১৯৫৮ সালের একদিন দেখা গেলো, অনেক বাড়ি থেকে জবাকুসুমের তেলের শিশি ফেলে দেওয়া হচ্ছে পুকুরে। অনেক বাড়ির উঠোনে গর্ত খুঁড়ে বই-কাগজপত্র পুঁতে ফেলা হচ্ছিল। আমাদের বাসায়ও তা হয়েছিল। মার্ক্সবাদী সব বই। কারণ সামরিক শাসন জারি হয়েছে, সে শাসন হাতি না ঘোড়া তা কেউ জানতো না। ইস্কান্দার মীর্জাকে আইয়ুব খান বললেন, বিপব হয়েছে।

এটি সাধারণ বিপব নয়। দেশে তা মৌলিক পরিবর্তন আনবে। বলা বাহুল্য, এই বিপব মানুষকে যেমন ভীত করেছিল তেমনি খানিকটা আনন্দিতও করেছিল। বাঙালি জানতো না সামরিক বাহিনীর বিপব কি। তারা ভেবেছিল দেশের রাজনীতি 'পরিচ্ছন্ন' হবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে, স্থিতিশীলতা ফিরবে। সামরিক শাসকরা ১৯৪৭-৫৮ এর 'কুশাসন'-এর জন্য দায়ী করলেন রাজনীতিবিদদের। আমলা, ব্যবসায়ী যারা মূল হোতা তাদের গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। এভাবে ঢাকা শহরে আমলা ও ব্যবসায়ীরা ধানমণ্ডি, গুলশান ও ডিওএইচএস পত্তন করেছিল। রাজনীতিকরা 'দুর্নীতিবাজ' কিন্' রাজনীতিকরা সেখানে ঠাঁই পায়নি পয়সার অভাবে।

আইয়ুব খান দেশে দলহীন রাজনীতি প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। সুবিধা হলো না দেখে পুরোনো মুসলিম লীগ ভেঙে 'ক্লিন মুসলিম লীগ' করতে চেয়েছিলেন। আসল রাজনীতিবিদরা যাতে রাজনীতিতে আসতে না পারেন সে কারণে পোডো, এবডো ও বিডি আইন করেছিলেন। তারপরের ঘটনা সবার জানা।

১৯৬৯ সালে জনতা এমন আছাড় মেরেছিল আইয়ুব আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের যে তারা চিরদিনের জন্য নিন্দিত হয়ে বিদায় নিলো। ইয়াহিয়া খান এলেন নতুন পাঞ্জাবিদের নিয়ে। গণতন্ত্র বিরোধী লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক করেছিলেন। তবে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্' আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা দিতে রাজি হননি। একই সুরে বলেছিলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মারাত্মক খারাপ পর্যায়ে এসেছে। পরিণামে পাকিস্থান ভাঙলো। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। ইয়াহিয়া খান এখন তার পেয়ারা পাকিস্থানে গালির সমান।

উলেখ্য, এরা ডানপন্থী বা এস্টাবলিশমেন্ট ঘেঁষা কোনো ব্যক্তি বা দলের ওপর স্টিম রোলার চালাননি। চালিয়েছেন মধ্য বা বামপন্থী দল/ প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির ওপর। একইভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করলেন। রাজনীতিবিদ, স্বৈরশাসন, দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন। 'পূর্বের অন্যায়ের প্রতিকার' স্বরূপ স্বাধীনতা বিরোধীদের তসলিমের সঙ্গে পুনর্বাসন করলেন।

রাজনীতিবিদদের জানালেন, রাজনীতি তাদের জন্য 'ডিফিকাল্ট' করে তুলবেন এবং দেশের উন্নয়নে, 'মানি ইজ নো প্রবেম'। কিছুদিনের মধ্যে অন্যান্যদের দিয়ে রাজনৈতিক দল গঠনে ব্যর্থ হয়ে নিজেই 'বিএনপি' গঠন করলেন। কারণ, আগের দলগুলো খারাপ। সুতরাং 'ক্লিন' দল দরকার। সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সংহত ও জোরদার করলেন। রাজনীতি/রাজনীতিবিদরা খারাপ, ভালো যারা গঠন করেছে বিএনপি– সেইসব রেনিগেড ও সামরিক বাহিনী। বেসামরিক আমলারা, ব্যবসায়ীরা ভালো। দুর্নীতি জাতীয়করণের পথ ধরলেন এবং এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ঋণখেলাপিদের সৃষ্টি করলেন। দেশে সামরিক সমাজ সৃষ্টির আগে নিহত হলেন। বলা যেতে পারে, মরে বেঁচে গেলেন। বাংলাদেশের অগস্ত্যযাত্রা তার সময়ে শুর" হয়েছিল।

এলেন তার ভাবশিষ্য এরশাদ। তিনি জিয়ার অনুগত ভাইস প্রেসিডেন্ট সাত্তারকে দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'দেশের আইনশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, জাতীয় স্বার্থে সারাদেশে সামরিক আইন জারি করা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।'

এরশাদ বললেন, ‘দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে। ভূতপূর্ব সরকারের অনুসৃত ভ্রান্ত্ম নীতির দর"ণ দেশে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে।’ তিনি আরো বললেন, **We will stay in power for about two years and then hand over power to a political party but obviously not to Awami League and Awami League will destroy the Armed forces.’**
এখানে এরশাদের বিষয়টি আরেকটু বিশদভাবে বলতে চাই কারণ আইয়ুব খানের পর তিনিই সামরিক শাসক হিসেবে ১০ বছর ছিলেন। বিএনপিকে উৎখাত করার কারণ হিসেবে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ঘোষণা করেছিলেন–
১. ‘ঃ ক্ষমতাসীনদের হীন স্বার্থপরতা, অযোগ্যতা, স্বজনপ্রীতি, সীমাহীন দুর্নীতি এবং কোন্দল এই সরকারকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দিয়েছে।
২. ‘ঃ আমি রাজনীতিবিদ নই, আমি একজন সৈনিক এবং সৈনিকের গর্ব নিয়েই জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাই। ঃআমাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হলো দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।
৩. ‘ঃ বর্তমান সামরিক শাসন কোনো সনাতনী পুরোনো ধ্যান-ধারণা বিধিবদ্ধ সামরিক শাসন নয়ঃ।
৪. ‘মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন বাস্ত্মবায়িত করতে হবে।’
এরশাদ কয়েকদিন সাইকেল চালালেন, রাজনীতিবিদদের গালিগালাজ করলেন, সামরিক কর্তৃত্ব ও সমাজ স্থাপন করতে চাইলেন, তারপর ক্লিন জেপি করলেন বিএনপিসহ সব দলের রেনিগেডদের নিয়ে। যার নাম হলো জাতীয় পার্টি। এরপর তিনি তার পরিবারসহ পুরো দল ঝাঁপিয়ে পড়লো দুর্নীতিতে। আর্মি পরিণত হলো লিমিটেড কোম্পানিতে। চরম আদর্শগত বিরোধ সত্ত্বেও ডান, মধ্য ও বামপন্থী সব মিলে এরশাদকে উৎখাত করলো।

উলিখিত সেনা শাসনগুলোর বৈশিষ্ট্য রাজনীতিবিদদের টার্গেট করা, দুর্নীতির অন্যতম তল্পিবাহক ব্যবসায়ী ও সামরিক-বেসামরিক আমলা ও ডানপন্থী দলগুলোকে ছাড় দেওয়া। প্রতিনিধি দ্বারা দল গঠন করা এবং দেশকে আরো অবনতির দিকে ঠেলে দেওয়া। ক্ষমতায় থেকে তারা প্রথমে গাছে, দালান কোঠায় চুনকাম করে, অবৈধ স্থাপনা, বস্ত্মি ভাঙে, কিছু রাজনীতিবিদদের গ্রেপ্তার করে। গরিবদের কষ্ট বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। আর হুমকি দিতে থাকে যতোদিন নিজেদের দল গড়ে না ওঠে এবং টু-পাইস কামানো থেকেও দূরে থাকে না।

১৯৯০ এর পর বিএনপি-জামাত-আওয়ামী লীগ ১৫ বছর শাসন করেছে। প্রথম দশ বছর বিএনপি ও আওয়ামী লীগ আমলে ধরপাকড়, সন্ত্রাস, লুটপাট সবই হয়েছে তবে তার একটা

মাত্রা ছিল। তাছাড়া ১৫ বছরের সামরিক শাসন গণতান্ত্রিক সব প্রতিষ্ঠান জঞ্জালময় ও ভেঙে দিয়েছিল। বিএনপির সঙ্গে ক্যান্টনমেন্টের গভীর যোগ নতুন নয়, কারণ এর নেত্রী সেখানেই থাকেন। কিন্' ডানপন্থী এস্টাবলিশমেন্ট/ দলের সমর্থনে জোট সরকার এসে দেশকে বিপর্যয়ের দিকে পুরোমাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন পত্রিকায় তাদের লুটপাটের যে কাহিনী ছাপা হচ্ছে তাতে বিস্মিত হতে হয়। এমন কোনো স্থান নেই যেখানে জামাত-বিএনপির হাত পড়েনি। ডানপন্থী এস্টাবলিশমেন্ট রক্ষা আবারো জর"রি হয়ে পড়েছিল। ড. ফখর"দ্দীন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হলেন। সাত্তার, এরশাদ যে সব ভাষণ দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন ইয়াজউদ্দিন একই ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে ক্ষমতা ছাড়লেন। মনে হয়, এ ধরনের একটা ভাষণ সব সময় মজুদ থাকে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের কয়েকটি বক্তৃতায় মানুষ মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরিচ্ছন্ন ভাষা, নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্বল্প কথায় বলা– মানুষ আশ্বস্ত হয়েছিল। মানুষ যা যা শুনতে চায় তাই তিনি বলেছেন এবং কিছু কিছু কাজও করেছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিছু কাজ যে প্রশংসিত হয়নি তা নয়।

শক্তির জোরে তারা সেগুলো করে ফেলেছেন। কিন্' এখন যতো দিন যাচ্ছে মানুষ ততো সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে। না, তার কথায় নয়, তার উপদেষ্টা ও সমর্থকদের কথাবার্তার কারণে ও আচরণে। এখানে একটি প্যাটার্ন লক্ষণীয়। সব সামরিক আমলে একজন ব্যারিস্টারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় দলে এবং তারপর দল ক্ষমতাসীনদের বিপদে ফেলার জন্য তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন, যেমন, মওদুদ আহমদ। এ আমলেও একজন ব্যারিস্টার আছেন, দেখা যাচ্ছে তিনিও কথাবার্তা বলতে ভালোবাসেন। তা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রায় দুই মাস পূরণ করতে যাচ্ছে। আমরা ঘরপোড়া গর", এখনই আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখছি।

সমালোচনা নয়, কারণ, জর"রি আইনের আমলে সমালোচনা করা যায় না। মানুষের ভাবনাচিন্তার একটি খণ্ড চিত্রমাত্র তুলে ধরছি খুব সংক্ষেপে সরকারের অবগতির জন্য। আগের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় লক্ষ্য করছি রাজনীতিবিদদের সবকিছুর জন্য দোষী করা হচ্ছে। সেনাপ্রধান লে. জে. মঈন এসব বিষয়ে একাধিকবার মন্তব্য করেছেন। তার বক্তব্যের মূল বিষয় –

১. 'আমাদের রাজনীতিকরা তাদের ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে কিছুই বোঝেন না।'
২. 'আমরা সরকার চালাচ্ছি না। তবে, আমরা এ সরকারকে সফল দেখাতে চাই।'
৩. 'গত ৩৫ বছরে এ দেশ ধ্বংস হয়েছে।'
৪. ২৮ অক্টোবর ঢাকার রাজপথের ঘটনাসমূহ উলেখ করে বলেন, 'এই মর্মান্তিক দৃশ্য কেবল দেশের মানুষ নয়, বিদেশীরাও দেখেছে। আর আমাদের সবাইকে ঘৃণা করেছে।'। (ভোরের কাগজ, ১.২.০৭)।

বর্তমান সেনাপ্রধান খুব সম্ভব আমাদের সমসাময়িক ও সমবয়সী। গত ৩৫ বছরে এ দেশের ঘটনাবলী আমরা দেখেছি। তিনিও দেখেছেন। তাই এ ধরনের মন্তব্যে খানিকটা দুঃখবোধ করছি। ৩৫ বছরে দেশ ধ্বংস হলে, আজ দেশটা টিকে আছে কীভাবে প্রায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের সাক্ষ্য নিয়ে। বলতে পারতেন, দেশের শাসকরা অনেক অন্যায়-অবিচার করেছে। কিন্', তারপর প্রশ্ন থেকে যায় সেই শাসক কারা ছিলেন? ১৫ বছর সেনা, ৫ বছর অপ্রত্যক্ষ সেনা, বাকি ১৫ বছর রাজনীতিবিদদের শাসন। একটি তথ্য দিই।

দুর্নীতির বির"দ্ধে সব সরকার, বর্তমান সরকারও সোচ্চার। মুজিব আমলে দুর্নীতির কারণে যে চার্জশিট দেওয়া হয় তাতে শাস্তি পেয়েছে ৪৭.৯৩ ও মামলায় শাস্তি হয়েছে ৩২.৮৩ জনের। জিয়াউর রহমান ও এরশাদের আমলে এ হার ১৬.৮২ ও ১০.৮২ এবং ৪৬.৬৭ ও ৩০.১৭ জন [এখানে মনে রাখতে হবে মুজিব আমল ছিল ৩ বছর, জিয়াউর রহমান ৭ ও এরশাদ ১০ বছর। খালেদা জিয়ার প্রথম আমলে ২২.৪৬ ও ২০.৮৪ ভাগ। পরিপূর্ণ সিভিল শাসনেই দুর্নীতিবাজরা বেশি শাস্তি পেয়েছে। সামরিক বা আধা সামরিক শাসনে নয়।

জাতিসংঘ উন্নত রাষ্ট্রের একটা মানদণ্ড করেছে যার দৈর্ঘ্য ১ হাজার মিটার। এই ১ হাজার মিটার পর্যন্ত পৌঁছেছে কয়েকটি দেশ। জিয়া যখন ক্ষমতায় তখন বাংলাদেশ ছিল ৩৪৫ মিটারে, ৫ বছরে তা এগোয় মাত্র ১৯ মিটার। এরশাদ আমলে ১০ বছরে ৫৫ মিটার [২৫+৩০]। খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় আসেন তখন বাংলাদেশ ৪১৯ মিটারে। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে এগিয়ে ছিলেন ৩৩ মিটার। হাসিনার আমলে সূচক ছিল ৪৫২, তিনি ৫ বছরে সেই সূচক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ৫৪ মিটার। খালেদা জিয়া ক্ষমতা ছাড়ার আগে বাংলাদেশ পৌঁছেছে ৫২০ মিটারে। খালেদা জিয়া এগিয়েছেন মাত্র ১৪ মিটার ৫ বছরে। দেখা যাচ্ছে মধ্যপন্থী পরিপূর্ণ সিভিল শাসনে বাংলাদেশ সবচেয়ে এগিয়ে থাকে। সবচেয়ে পিছিয়ে থাকে সামরিক বা ডানপন্থী শাসনে।

জাতিসংঘ উন্নত রাষ্ট্রের একটা মানদণ্ড করেছে যার দৈর্ঘ্য ১ হাজার মিটার। এই ১ হাজার মিটার পর্যন্ত্ম পৌঁছেছে কয়েকটি দেশ। জিয়া যখন ক্ষমতায় তখন বাংলাদেশ ছিল ৩৪৫ মিটারে, ৫ বছরে তা এগোয় মাত্র ১৯ মিটার। এরশাদ আমলে ১০ বছরে ৫৫ মিটার [২৫+৩০]।

খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় আসেন তখন বাংলাদেশ ৪১৯ মিটারে। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে এগিয়ে ছিলেন ৩৩ মিটার।

হাসিনার আমলে সূচক ছিল ৪৫২, তিনি ৫ বছরে সেই সূচক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ৫৪ মিটার। খালেদা জিয়া ক্ষমতা ছাড়ার আগে বাংলাদেশ পৌঁছেছে ৫২০ মিটারে। খালেদা জিয়া এগিয়েছেন মাত্র ১৪ মিটার ৫ বছরে। দেখা যাচ্ছে মধ্যপন্থী পরিপূর্ণ সিভিল শাসনে বাংলাদেশ সবচেয়ে এগিয়ে থাকে। সবচেয়ে পিছিয়ে থাকে সামরিক বা ডানপন্থী শাসনে। রাজনীতিবিদরা ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে কিছুই বোঝেন না এ কথা কতোটা ঠিক? সব রাজনীতিবিদ কি তাই? যদি তাই হয় তাহলে সব রাজনীতিবিদকে ধরেন না কেন? কিছু কিছুকে কেন ধরা হলো? অর্থাৎ কিছু কিছু রাজনীতিবিদ ব্যক্তি স্বার্থের বাইরেও বোঝেন। যেমন, জিয়া, এরশাদ, অনেক আমলা, ব্যবসায়ীও এ কথা বোঝেন না। তিনি বলছেন, সামরিক বাহিনী দেশ চালাচ্ছে না, তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সহযোগিতা করছে। ইয়াজউদ্দিনের সময় যখন সেনাপ্রধান ছিলেন জেনারেল মঈন তখন কিন' তিনি বক্তৃতা দেননি। এখন ঘন ঘন দিচ্ছেন। কারণ, সিভিল সরকার থাকলে সেনাপ্রধানরা সাধারণত বক্তৃতা দেন না। ২৮ তারিখের রাজপথের ঘটনা তাকে মর্মাহত করেছে। এ কথা বিএনপি-জামাত নেতারাও বলেছেন। ঐ দিন আন্দোলনরত দলগুলোর সঙ্গে সরকারি দলের সংঘর্ষ হয়। সরকারি দল আক্রমণ করে। সংঘর্ষ হয় ও দুজন নিহত হয়। ঘটনাটি প্রকাশ্যে ঘটেছে। বাঁশখালীতে ১১ জনের হিন্দু পরিবারকে পুড়িয়ে মেরেছে জোট সমর্থকরা, এথনিক ক্লিনজিং চালিয়েছে, হাসিনার সভায় গ্রেনেড হামলা করে ২১ জনকে হত্যা করা হয়েছে, কিবরিয়া ও আহসানউলাহ মাস্টারকে হত্যা করা হয়েছে। আর লুট ধর্ষণের তো কথা নেই। মিথ্যা মামলায় হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার করেছে যার থেকে আমরাও বাদ যাইনি। এসব কিছুই দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেনি, করেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পক্ষপাতিত্বের বির"দ্ধে আন্দোলনে। জেনারেল মঈন, খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করি আমরা আন্দোলন না করলে ফখর"দ্দীন আহমদ ক্ষমতায় আসতেন, আমাদের আপনি হেদায়েত করার সুযোগ পেতেন?

এ সব প্রশ্ন উঠছে, কারণ যারা আন্দোলন করেছে জোটের নেতৃস্থানীয় লুটেরাদের গ্রেপ্তারের

সময় তাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কেন? আওয়ামী লীগের নেতারাও আগে দুর্নীতি করেছিল?

তাহলে এর আগে যারা করেছিলেন তাদের কী হবে? ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীরের নামে এ পর্যন্ত্ম আন্দোলন করা ছাড়া আর কখনো দুর্নীতির কথা বলা হয়নি। একই কথা পংকজ দেবনাথ ও আওলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? মমতাজ লতিফ লিখেছেন 'বাজারে আমাকে কয়েকজন দোকানি প্রশ্ন করেছে হারিছ চৌধুরীর সঙ্গে ড. আওলাদ হোসেনের বা ফালুর সঙ্গে মহীউদ্দীন খান আলমগীরের দুর্বৃত্তপনার দিক থেকে কোনো তুলনা চলে? চলে না এতো সোজা উত্তর। ওদের প্রশ্ন বাংলাভাইয়ের গডফাদারদের ধরে না কেন?' (সংবাদ, ৮.০২.০৭)।

আওয়ামী লীগের যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে গত ৫ বছর তারা নির্যাতিত হয়েছেন, আন্দোলনও করেছেন যার ফলে ড. ফখর"দ্দীন বা জেনারেল মঈন ক্ষমতায়। সে জন্যই কি এই শাস্ত্মি? অনেকে বলছেন, সমতা আনার জন্য এই গ্রেপ্তার। সেটি হলে তা তো ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। আরো আছে, বিএনপির এই একডজনই কি অর্থ লুট বা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে? কয়েকজন বাদে সবাই এর সঙ্গে যুক্ত ছিল? যিনি পালের গোদা তার গায়ে জলের স্পর্শটিও লাগেনি। অনেকে ঠাট্টা করে বলেন, তার মামারা আছেন কে আর তার কী করবে? বিমান বাহিনীর বিমান কেনা নিয়ে জোট সরকারের আমলে যাদের বির"দ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তাদের কী হবে? এ রকম অজস্র অভিযোগ তোলা যায়। খবরের কাগজেই তা আসছে। কিন্' আওয়ামী লীগের যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে পত্রিকাগুলো তাদের বির"দ্ধে একটি লেখাও লিখেনি।

ড. ফখর"দ্দীনের সরকার মনে করেন রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের জন্য আওয়ামী লীগ আর বিএনপিই দায়ী? জামাত বা কোনো ডানপন্থী দলই জড়িত নয়। এরশাদের দলও নয়? যদিও জামাতের দুর্বৃত্তায়নের বির"দ্ধে কাগজগুলো নিয়মিত লিখছে। পুরোনো পাপ ধরতে গেলে ১৯৭১ এর লুট ধর্ষণ স্বাধীনতার বিরোধিতার জন্য প্রথমেই জামাতকেই ধরতে হয়। সরকারের কথক ব্যারিস্টার সাহেব বলছেন, এখনই আমলা, ব্যবসায়ীদের ধরা হবে না। অথচ সবাই জানে, গত আমলে দেশের সবচেয়ে ক্ষতি করেছে আমলারা, কোনো ম্যানুয়েল না মেনে আর ব্যবসায়ীরা কোনো এথিকস না মেনে। অথচ, তারা এখন যুধিষ্ঠির।

এ রকম প্রকাশ্য পক্ষপাতিত্ব দেখালে জোট আমল যেমন নানা প্রশ্নে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এ আমলও সেভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এবং এটি আমাদের কাম্য নয়। এ ক্ষেত্রে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ যা বলেছেন তা যুক্তিযুক্ত। তার মতে, 'দুর্নীতি কেবল রাজনীতিবিদরা করেন না, সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তারাও করে থাকেন। জর"রি অবস্থায় আমাদের সশস্ত্র

বাহিনীর নানা ক্ষমতা থাকে কিন্' এর ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও নিয়মতান্ত্রিকতা থাকবে– এটা আমাদের আশা করা উচিত। আমরা আশা করবো, আটক করা কেবল চমক নয়, আমাদের বৃহৎ স্বার্থের দিকে দৃষ্টি থাকতে হবে।' (প্রথম আলো, ৫.২.০৭)

প্রশ্ন আরো আছে, খবরের কাগজে যে সব সরকারি কর্মচারীর দুর্নীতির ও ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা বিস্ত্মারিত ছাপা হচ্ছে তাদের ধরা দূরে থাকুক বিন্দুমাত্র ধমকও দেওয়া হয়নি যেমন, শহীদুল আলম। নতুন নির্বাচন কমিশনার সাখাওয়াতের সঙ্গে পরিচয় আছে। হাসিখুশি, অমায়িক। তার বির"দ্ধে পত্রিকায় অভিযোগ উঠেছে। সাখাওয়াত এ বিষয়ে মন্ত্মব্য করেননি। কিন্', যারা তাকে মনোনয়ন দিয়েছেন, তাদের বলা উচিত ছিল, এ অভিযোগ মিথ্যা। কারণ, দুর্নীতি উচ্ছেদের সংকল্প নিয়ে এসে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত এমন কাউকে তারা সাংবিধানিক পদে নিয়োগ দিতে পারেন না। যদি তারা তা না বলেন, তাহলে তো অভিযোগ সত্য বলে প্রতীয়মান হবে এবং এ কথাই বলা হবে তারা জোটের নীতিই অনুসরণ করছেন। প্রথম আলো বড়ো একটা খবর ছেপেছিল; তেজগাঁওয়ে দুর্নীতি করে বিএনপি মিডিয়া পলী করা হয়েছে বিএনপি সমর্থকদের কম দামে জমি দিয়ে। সেখানে কি বর্তমান উপদেষ্টাদের কেউ জমি পেয়েছেন? এ নিয়ে বাজারে প্রবল গুঞ্জন। সরকার কি যারা জমি পেয়েছে সেখানে তাদের পুরো তালিকা প্রকাশ করবেন?

এ প্রসঙ্গে বলি। ড. আলমগীরের বাসায় দুদিন যৌথবাহিনী গেছে। ৯ তারিখ যাওয়ার পর কর্মচারীদের ধমক দিয়েছে যার মধ্যে একজন কর্মচারীকে বলা হয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহীর বাসায় চাকরি করো কেন? ইত্যাদি। জোটের আমলেও তার বির"দ্ধে একই অভিযোগ আনা হয়েছিল। সুতরাং, সে বেচারা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। পত্রিকায় দেখলাম, তার বির"দ্ধে মামলা হয়েছে, আত্মগোপন করার জন্য। এ বিষয়টি হাইকোর্টে এফিডেভিটে উলেখ করেছেন ড. আলমগীরের ভাই।

এই যদি হয় তাহলে বলতে হয়, এই কঠিন সরকার পুলিশের কিছুই করতে পারেনি। তারা এমন মামলা করেছে যার সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক নেই। সাইফুর রহমানের বির"দ্ধে মামলা হলে তারা নেয় না। এবং সরকারও কিছু বলে না। অথচ এই লোকটি কম ক্ষতি করেননি গত পাঁচ বছরে। নির্বাচন কমিশন তো বাতিল করেছে এ সরকার যা ছিল জনগণের দাবি। কিন্', যাদের জন্য এতো মৃত্যু, আর্থিক ক্ষতি ও অর্থ অপচয়ের অভিযোগ-এ গুলোর কি হবে? ধরা যাক, বস্তি বা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সহস্র মানুষ নিঃস্ব হচ্ছেন কিন্' যারা এগুলো করেছে তাদের কাউকে ধরা হয়েছে? আবাসিক এলাকাকে অনাবাসিক এলাকা করা বা ঘরবাড়ির অবৈধ অংশ কি রাজউক এতোদিন দেখেনি বা দুর্নীতি করেনি, তাদের কি হলো? এ রকম ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়।

এটা ঠিক, জোটবিরোধী আন্দোলন সফল হতো কিন্' তাতে আরো অনেক ক্ষতি হতো দেশ ও দশের। জর"রি অবস্থা ঘোষণা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সে বিপদ থেকে দেশকে বাঁচিয়েছেন। সবাই চেয়েছিল যারা এ বিপদ ডেকে আনছিল তাদের বিচার। অন্তত প্রাথমিকভাবে। আমরা বলতে চাচ্ছি, বাগাড়ম্বর না করে যারা দুর্নীতিবাজ বলে খ্যাতি অর্জন করেছে গত ৫ বছর তাদের দুর্নীতির যথাযথ তদন্ত করে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে বিচার কর"ন। কিন্' আগে করা হচ্ছে গ্রেপ্তার, তারপর হুমকি-ধামকি, আইন সংশোধন ইত্যাদি। এতে বিভিন্ন অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। আইনবিদদের অনেকে বলছেন, 'দেশের প্রচলিত আইনের সঙ্গে এ আইন সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তারা আরো বলেন, শতকরা সাড়ে ৭ ভাগ ট্যাক্স দিয়ে কালো টাকা সাদা করার বিধান রয়েছে। এ ছাড়া আইনের ১৯- এ ধারা অনুযায়ী যতো খুশি টাকা বিনিয়োগ করা যাবে, এর উৎস জানাতে বাধ্য নন। এ দুটি আইন সত্ত্বেও জর"রি ক্ষমতা বিধিমালায় বলা হয়েছে, অভিযুক্তকে তার সম্পদের হিসাব দিতে হবে– এটা স্ববিরোধী'। (যুগান্তর, ১৬.২.০৭) প্রচলিত আইনে যারা টাকা সাদা করেছেন [যদিও তা ঠিক নয়] এখন যদি বলা হয় সেটি অন্যায় তা হলে আইনের ধারাবাহিকতা থাকে না। এখন যে আইন করা হবে ভবিষ্যতে তাও বাতিল হতে পারে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে দেশে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে নতুন মাত্রা ও বিতর্ক যুক্ত হয়েছে ড. ইউনূসের 'নাগরিক শক্তি'র সৃষ্টিতে।

ড. ইউনূস রাজনীতিবিদদের তীব্র সমালোচনা করে নিজেই রাজনীতিতে এসেছেন যা অসঙ্গতিপূর্ণ। তিনি বলেছেন, 'নতুন ভঙ্গিতে রাজনীতি করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।' (ইত্তেফাক)। আরো জানিয়েছেন, রাজনৈতিক দল করার জন্য সময় অনুকূলে। ড. ইউনূস রাজনীতিতে নেমে দল করতে সভা সমিতিতে বক্তব্য রাখছেন, কিন্' অন্যদের তা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এটি কি অন্যরা মানবেন বা যথাযথ বলবেন? তিনি বলেছিলেন '৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। এখন তা বলছেন না। 'সুশীল সমাজের' অনেকেও এখন বলছেন সব পরিষ্কার হলে নির্বাচন করা যাবে। এর আগে আর কখনও 'সুশীল সমাজ' কোনো সরকারকে এতো সমর্থন দেয়নি। এদের বড়ো অংশ বিভিন্ন এনজিওর সঙ্গে যুক্ত। এ রকম সিনারিও ২০০১ সালেই অনুমান করা হয়েছিল যা এর আগে বহুবার বহুজন লিখেছেন। সুতরাং এতে আমরা খুব একটা অবাক হচ্ছি না। বর্তমান সরকারের মূল ম্যান্ডেট নির্বাচন করা। বিভিন্ন ফ্রন্ট খুলে তারা সামলাতে পারবেন? বা এর জন্য যে সময় দরকার তা কি সবাই মানবেন? কারণ, তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে। কীভাবে দ্র"ত নির্বাচন সম্পন্ন করা যায় সে দিকে মনোযোগ দেওয়াই বোধহয় কাম্য। ইতিহাসে দেখা যায় এ ধরনের সব সরকারই 'ক্লিন' দল চায়। সেই ধারাবাহিকতায় অনেকের অনুমান বর্তমান সরকারও এক ধরনের ক্লিন দল চান, তবে সেটি ডান বা মুদু ডান হলে ভালো হয়। মধ্য বা মৃদু বাম নয়। আগেও তাই হয়েছে। এবং এ প্রক্রিয়ায় মধ্য ও বাম দলের সাংগঠনিক শক্তি ধ্বংস করা না গেলেও যদি হ্রাস করা যায় তবে ভালো। এর বিপরীতে উত্থান হবে নতুন 'ক্লিন' ডানের। আর এরা মৈত্রী গড়বে যাদের ছোঁয়া হয়নি এমন ডানের সঙ্গে। ব্যবসায়ী আমলাদের সঙ্গে। সেটি 'ক্লিন বিএনপি' হতে পারে, ড. ইউনূস বা অন্য কেউই হতে পারেন। তবে এগুলো সবই স্পেকুলেশন, গত দুমাসের বিভিন্ন ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়গুলো খুব স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

উপমহাদেশের তিনটি দেশে ক্ষমতার প্রধান তিনজন সাবেক বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তা। ভারতে ড. মনমোহন সিং, পাকিস্তানে শওকত আজিজ ও বাংলাদেশে ড. ফখর"দ্দীন। এবং এসব সরকারে বিশ্বব্যাংকের খানিকটা প্রভাব থাকতেও পারে। অনেকে বলেন, ইয়াজউদ্দিন যা করছিলেন তার ফলে জর"রি অবস্থা ঘোষণা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছিল। এতে উদ্যোগ নেন বিশ্বব্যাংক ও কূটনীতিকরা, কার্যকর করে সেনাবাহিনী আর সামনে থাকেন কিছু সিভিলিয়ান। তবে, এটা পরীক্ষিত সত্য যে, বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন অনুসরণ করে আজ পর্যন্ত কোনো দেশের উন্নতি হয়নি বরং ক্ষতি হয়েছে। সবশেষে আমরা বলবো, আমরা চাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন করতে পারেন কোনো বিতর্কে না জড়িয়ে। তাদের গড়া নির্বাচন কমিশন মেনে নিয়েছে সবাই– এটি সুখবর। তাদের ম্যান্ডেট যেন তারা পালন করতে পারেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, যারা রাজনীতিক নন তারা রাজনীতির দিকনির্দেশনা দেবেন কীভাবে?

সেই ১৯৫৮ থেকে আমরা আতঙ্কে থাকি। যারা আতঙ্কের হোতা তাদের একটা বড়ো অংশ সব সময় পার পেয়ে যায়। আমরা এক আতঙ্ক থেকে আরেক আতঙ্কের মুখোমুখি হই। এখনো কি আমরা আতঙ্কে নেই? যারা গরিব তারা আতঙ্কে কবে উৎখাত হয়, আমরা আতঙ্কে, কখন কাকে বিনা কারণে বা অকারণ দেখিয়ে তুলে নেওয়া হয়, অন্যদিকে জিনিসপত্রের দাম তো আরো বাড়ছে। আতঙ্কে আতঙ্কে সারাটা জীবন কেটে যাক তা কে চায়? বর্তমান সরকার কি পারবে আমাদের সে আতঙ্ক নিরসন করতে। অন্তত একবারের জন্য।

**From: Bhorer Kagoj**

http://bhorerkagoj.net/online/news.php?id=47596&sys=3
http://bhorerkagoj.net/online/news.php?id=47755&sys=3
http://bhorerkagoj.net/online/news.php?id=47921&sys=3